#আমি পদ্মজা পর্ব ৪৮

ঘটনাটি পদ্মজার চোখে পড়তেই ছুটে আসে। রানি আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব। সে পূর্ণাকে তুলতে দৌড়ে আসতে গিয়ে শাড়ির সাথে পা প্যাঁচ লাগিয়ে পূর্ণার চেয়ে ঠিক এক হাত দূরে ধপাস করে পড়ল! এ যেন ধপাস করে পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুবকটি হাসবে নাকি সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সেকেন্ড দুয়েক ভেবে মনস্থির করল, হাসা ঠিক হবে না। সাহায্য করা উচিত। কলপাড় থেকে এক পা নামাতেই পদ্মজা চলে আসে। পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। যুবকটি রানিকে সাহায্য করে উঠার জন্য। পদ্মজা উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল,'খুব ব্যথা পেয়েছিস?'

পূর্ণার মুখ ঢেকে আছে রেশমি ঘন চুলে। আড়চোখে একবার যুবকটিকে দেখল। এরপর

মিনমিনিয়ে বলল,’না।’
ফরিনা ছুটে এসে বললেন,’এইডা কেমনে হইলো। এই ছেড়ি এমনে আইলো কেন? ও ছেড়ি কোনহানে দুঃখ পাইছো?’
পূর্ণা নরম কন্ঠে বলল,’চাচি,ব্যাথা পাইনি।’
‘পাওনি মানে কী? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছো না। পদ্মজা,ওকে নিয়ে যাও। কাদা মেখে কী অবস্থা!’ বলল আমির।
রানি পদ্মজা আর আমিরকে দেখে প্রচন্ড অবাক হয়েছে! খুশিতে তার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল,’দাভাই? তুমি আইছো! পদ্মজা, এতোদিনে আমরারে মনে পড়ছে?’
পদ্মজা মৃদু হেসে বলল,’তোমাকে সবসময়ই মনে পড়ে আপা। আমরা পরে অনেক গল্প করব। পূর্ণাকে নিয়ে এখন ভেতরে যাই।’

পদ্মজা এবং ফরিনা পূর্ণাকে ধরে ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। পিছু পিছু রানিও গেল। যুবকটি আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল,’আসসালামু আলাইকুম আমির ভাই। চিনতে পারতাছেন?’
আমির যুবকটিকে চেনার চেষ্টা করল। এরপর বলল,’মৃদুল না?’
‘জি ভাই।’
আমিরের হাসি প্রশস্ত হলো। মৃদুলের সাথে করমর্দন করে বলল,’সেই ছোটবেলায় দেখেছি। কতবড় হয়ে গেছিস। চেনাই যাচ্ছে না।’
‘আমার ঠিকই আপনারে মনে আছে।’
আমির মৃদুলের বাহুতে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল,’ছোটবেলা তো তুমি করে বলতি। এখন আপনি আপনি বলছিস কেন?’
মৃদুল এক হাতে ঘাড় ম্যাসাজ করে হাসল। এরপর বলল,’১৬-১৭ বছর পর দেখা হইছে

তো।’
‘তো কী হয়েছে? তুমি বলে সম্বোধন করবি। গোসল করছিলি নাকি?’
‘জি।’
‘কাপড় পাল্টে আয়,অনেক আলাপ হবে।’
‘আচ্ছা ভাই।’

আমির নারিকেল গাছের পাশে তাদের ব্যাগ দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা নিল,এরপর অন্দরমহলের দিকে গেল।

বৈঠকখানায় পদ্মজা বসে আছে। পূর্ণার কোমরে,পায়ে গরম সরিষা তেল মালিশ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছে। হুমকিও দিয়ে এসেছে,ঘর থেকে বের হলে একটা মারও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা মুখ দেখে মনে হয়েছে,আর বের হওয়ার সাহস করবে না। বেশ জোরেই পড়েছিল। পা,কোমর লাল হয়ে গেছে। এই বাড়িটা মৃতপ্রায়। আগে তাও মানুষ আছে

বলে মনে হতো। এখন মনেই হয় না এই বাড়িতে কেউ থাকে। নির্জীব, স্তব্ধ। রান্নাঘর থেকে বেশ কিছুক্ষণ পর পর টুংটাং শব্দ আসছে। ফরিনা এবং আমিনা তাড়াহুড়ো করে রান্না করছেন। আমির বের হয়েছে। বাড়িতে মাত্রই এলো আর কীসের কাজে বেরিয়েও পড়ল। স্তব্ধতা ভেঙে একটা ছোট বাচ্চা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে। বাচ্চাটার কোমরে, গলায় তাবিজ। তাবিজের সাথে ঝনঝন শব্দ তোলা জাতীয় কিছু গলায় ঝুলানো। পদ্মজা বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। রানি বৈঠকখানায় এসে বাচ্চাটিকে বলল,'আলো আম্মা,এদিকে আয়। তোর গায়ে ময়লা। পদ্ম মামির কাপড়ে লাগব।'
পদ্মজা আলোর গাল টেনে বলল,'কিছু হবে না। থাকুক।'
এরপর আলোর গালে চুমু দিল। আলোর দুই বছর। রানির মেয়ে হয়েছে শুনেছিল পদ্মজা।

কিন্তু আসতে পারেনি দেখতে। এবারই প্রথম দেখা। পদ্মজা বলল,'আলো ভাগ্যবতী হবে। দেখতে বাপের মতো হয়েছে।'

বাপের মতো হয়েছে কথাটি শুনে রানির মুখ কালো হয়ে যায়। তার প্রথম বাচ্চা মারা যাওয়ার এক বছরের মাথায় সমাজের নিন্দা থেকে বাঁচাতে খলিল হাওলাদার রানির জন্য পাত্র খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু কেউই রানিকে বিয়ে করতে চায় না। সবাই জেনে গিয়েছিল,রানি অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছে। এরপর বাচ্চাটা মারাও গেল। কোনো পরিবার রানিকে ঘরের বউ করতে চাইছিল না। এদিকে বিয়ে দিতে না পেরে সমাজের তোপে আরো বেশি করে পড়তে হচ্ছিল। খলিল হাওলাদার পিতা হয়ে রানিকে ফাঁস লাগিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তখন মজিদ হাওলাদার মদনকে ধরে আনলেন। মদন,মগার বাবা মা নেই। দুই ভাই

এই বাড়িতেই ছোট থেকে আছে। এই বাড়ির সেবার কাজে নিযুক্ত। বাধ্য হয়ে মদনের সাথে বাড়ির মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। মদন কামলা থেকে ঘর জামাই হয়। রানি মন থেকে মদনকে আজও মানতে পারেনি। কখনোও পারবেও না। ঘৃণা হয় তার। মাঝে মাঝে আলোকেও তার সহ্য হয় না। আলোর মুখটা দেখলেই মনে হয়, এই মেয়ে মদনের মেয়ে। কামলার মেয়ে!

আলো আধোআধো স্বরে বলল,’নান্না,নান্না।’

পদ্মজা আদুরে কণ্ঠে বলল,’নানুর কাছে যাবে?’

আলো পদ্মজার কোল থেকে নামতে চাইল। পদ্মজা নামিয়ে দিল। আলো দৌড়ে রান্নাঘরে যায়। রানি বলল,’আম্মার জন্য পাগল এই ছেড়ি। সারাবেলা আম্মার লগে লেপ্টায়া থাকে।’

‘তুমি নাকি আলোকে মারধোর করো?’

রানি চমকাল। প্রশ্ন করল,’কেলা কইছে?’

‘শুনেছি। আলো একটা নিষ্পাপ পবিত্র ফুল। ওর কী দোষ?’

রানি চুপ করে রইল। পদ্মজা বলল,'সব রাগ এইটুকু বাচ্চার উপর ঝাড়া ঠিক না আপা।'
'আমার কষ্টডা বুঝবা না পদ্মজা।'
'বুঝি। এতোটা অবুঝ না আমি। আলো মদন ভাইয়ার মেয়ে এটা ঠিক। কিন্তু তোমারও তো মেয়ে। তোমার গর্ভে ছিল। তোমার রক্ত খেয়েছে দশ মাস।'
'আমি কী আমার ছেড়িরে ভালোবাসি না? বাসি। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। জানো পদ্মজা,আবদুল ভাইয়ের কথা মনে হইলে আমার সব অসহ্য লাগে। একলা একলা কাঁনদি। তহন আলো কানলে...আমি ওরে এক দুইডা থাপ্পড় মারি। পরে আফসোস হয় কেন মানলাম ছেড়িডারে। ও তো আমারই অংশ।'
'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো। নিয়তির উপর কারো হাত নেই। অতীত ভুলতে বলব না। কিছু অতীত ভুলা যায় না। কিন্তু চাইলেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে বাঁচা যায়। নিজেকে

মানিয়ে নাও। আলোর প্রতি যত্নশীল হও। মানুষের মতো মানুষ করো। একটা মেয়েকে নিয়ে সমাজে বাঁচা যুদ্ধের মতো। গোড়া থেকে খেয়াল দাও।'

'তোমার কথা হুনলে বাঁচার শক্তি পাই পদ্মজা।'

পদ্মজা হাসল। বৈঠকখানায় আমির এসে প্রবেশ করল। তার পিছু পিছু মৃদুল। মৃদুলকে দেখে রানি হাসল। পদ্মজাকে দেখিয়ে বলল,'এইযে এইডা হইছে,পদ্মজা। তোর ভাবি।'

মৃদুল পদ্মজাকে সালাম করার জন্য ঝুঁকতেই পদ্মজা বলল,'না,না। কোনো দরকার নেই। বসুন আপনি।'

মৃদুল বসল। এরপর পদ্মজাকে বলল,'আপনের কথা কথা অনেক শুনছি। আজ দেখার সৌভাগ্য হলো।'

আমির পদ্মজাকে বলল,'ওর নাম মৃদুল। রানির মামাতো ভাই। ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে

কয়দিন পর পর আসতো। যখন আট-নয় বছর তখন দূরে চলে যায়। আর দেখা হয়নি। চাইলেই দেখা হতো। কেউ চায়নি। তাই দেখাও হয়নি।'

'কোথায় থাকেন?' জানতে চাইল পদ্মজা।

'জি ভাবি,রামপুরা।'

রামপুরার কথা পদ্মজা শুনেছে। তাদের জেলার শহর এলাকার নাম রামপুরা। সবাই চিনে এই এলাকা। ছেলেটার চেহারা উজ্জ্বল, চকচকে। হাসিখুশি! আলাপে আলাপে জানতে পারল,মৃদুল পদ্মজার চেয়ে দুই বছরের বড়। মেট্রিক ফেইল করার পর আর পড়েনি। মিয়া বংশের ছেলে। কথাবার্তায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ দুই রূপই আছে। আর ভীষণ রসিক মানুষও বটে!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা দোতলায় গেল। সাথে আমির রয়েছে। নূরজাহান বেশ কয়েক মাস ধরে অসুস্থ।

শরীরের জায়গায় জায়গায় ঘা। চামড়া থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। সারাক্ষণ যন্ত্রনায় আর্তনাদ করেন। নূরজাহানের ঘরে ঢুকতেই নাকে দূর্গন্ধ লাগে। পদ্মজা নাকে রুমাল চেপে ধরে। নূরজাহান বিছানার উপর শুয়ে আছেন। সময়ের ব্যবধানে একেবারে নেতিয়ে গিয়েছেন। বয়সটা যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। হাড্ডি ভেসে আছে। লজ্জাস্থান ছাড়া পুরো শরীর উন্মুক্ত। এক পাশে লতিফা দাঁড়িয়ে আছে। নূরজাহানের মাথার কাছে একজন কবিরাজ বসে রয়েছেন। একটা কৌটা থেকে সবুজ দেখতে তরল কিছু নূরজাহানের ক্ষত স্থানগুলোতে লাগাচ্ছেন। পদ্মজা নূরজাহানের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নাক থেকে রুমাল সরিয়ে দূর্গন্ধের সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ডাকল,'দাদু? দাদু...শুনছেন।'

নুরজাহান ধীরে ধীরে চোখ খুলেন। পদ্মজা প্রশ্ন করল,'খুব কষ্ট হয়? কোথায় কোথায় বেশি যন্ত্রণা হয়?'
নূরজাহান শুধু তাকিয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজার বুকটা হাহাকার করে উঠল। বয়স্ক একজন বৃদ্ধা কত কষ্ট করছে! লতিফা বলল,'দাদু কথা কইতে পারে না। খালি কান্দে।'
নূরজাহানের অসহায় চাহনি দেখে পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। সে নূরজাহানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,'আল্লাহর নাম স্বরণ করেন। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য্য ধরুন।'
তারপর লতিফাকে বলল,'ভালো করে খেয়াল রেখো উনার।'
আমির বেশ অনেকক্ষণ নূরজাহানের সাথে কথা বলল। নূরজাহান জবাব দেন না,শুধু উ,আ শব্দ করেন। আমিরের দুই চোখ বেয়ে

জল পড়ে। পদ্মজার ভালো লাগে না দেখতে। সে আমিরকে বুঝিয়ে,শুনিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। বারান্দা পেরোনোর পথে রুম্পার ঘরের দরজা খোলা দেখল পদ্মজা। যাওয়ার সময় তো বন্ধই ছিল। পদ্মজা ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। দেখল,কেউ নেই। পালঙ্কও নেই। সে আমিরকে প্রশ্ন করল,'রুম্পা ভাবি কোথায়?' আমিরও এসে উঁকি দিল। খালি ঘর। সে অবাক স্বরে বলল,'জানি না তো।'

পদ্মজা চিন্তায় পড়ে গেল। হেমলতা মারা যাওয়ার পর গ্রামে আর থাকেনি। শহরে ফিরে যায়। এক মাসের মাথায় জানতে পারল, সে গর্ভবতী। গর্ভাবস্থার প্রথম পাঁচ মাস খুব খারাপ যায়। প্রতি রাতে হেমলতাকে স্বপ্নে দেখতো। ছয় মাসের শুরুতে ফরিনা নিয়ে আসেন গ্রামে। এ সময় পদ্মজার একজন মানুষ দরকার। কাছের মানুষদের দরকার। তাই আমিরও নিষেধ করেনি। তার মধ্যে আবার

মারা গেলেন মোর্শেদ। পদ্মজা আরো ভেঙে পড়ে। কাছের মানুষদের সহযোগিতায়, বাচ্চার কথা ভেবে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে। সফলও হয়। তখন পদ্মজা অনেকবার চেষ্টা করেছে রুম্পার সাথে দেখা করার। মদন আর,নূরজাহানের নজরের বাইরে গিয়ে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। এরপর কোল আলো করে এলো ফুটফুটে কন্যা। পদ্মজা তারপরও চেষ্টা চালিয়ে গেল। রুম্পাকে নজরবন্দি করে রাখাটা খটকা বাড়িয়ে দেয়।

একদিন সুযোগ আসে। সেদিন রাতে নূরজাহান, মদন, আমির,রিদওয়ান,আলমগীর সবাই যাত্রাপালা দেখতে যায়। বাড়িতে বাকিরা থাকে। দুই তলায় শুধু পদ্মজা তার মেয়ে পারিজা আর ফরিনা ছিল। ফরিনার দায়িত্বে পারিজাকে রেখে রুম্পার ঘরে যায় পদ্মজা। রুম্পা তখন প্রস্রাব,পায়খানার উপর অচেতন

হয়ে পড়েছিল। পদ্মজা নাকে আঁচল চেপে ধরে সব পরিষ্কার করে। রুম্পার জ্ঞান ফেরায়। জানতে পারে তিন দিন ধরে রুম্পাকে খাবার দেয়া হচ্ছে না। পদ্মজা খাবার নিয়ে আসে। রুম্পাকে খাইয়ে দেয়। কথা বলার সুযোগ হওয়ার আগেই ফরিনার চিৎকার ভেসে আসে। ফরিনার কাছে পারিজা আছে! পদ্মজার বুক ধক করে উঠে। ছুটে বেরিয়ে আসে। ঘরে এসে দেখে ফরিনা নেই। ফরিনার আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা সেই আর্তনাদের সাথে দুমড়ে,মুচড়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে উল্টিয়ে পড়ে। তবুও ছুটে যায়। ফরিনার কান্নার চিৎকার অনুসরণ করে অন্দরমহলের বাইরে বেরিয়ে আসে। চাঁদের আলোয় ভেসে উঠে তার তিন মাসের কন্যার রক্তাক্ত দেহ। ফুটফুটে কন্যা! ছোট ছোট হাত,পাগুলো নিথর হয়ে পড়ে আছে। সময় থেমে যায়। মনে হয়, নিশুতি রাতের প্রেতাত্মারা

একসঙ্গে, একই স্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়। কোন পাষাণ মানবসন্তান তিন মাসের বাচ্চার গলায় ছুরি চালিয়েছে? তার কী হৃদয় নেই? পদ্মজা মেয়ের নাম ধরে ডেকে চিৎকার দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

পুলিশ আসে,তদন্ত হয়। ফরিনা দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হাত বাড়িয়ে দেখেন,পারিজা নেই। দ্রুত উঠে বসেন।

পদ্মজা নিয়ে গেল নাকি খুঁজতে থাকেন।

বারান্দা থেকে বাইরে চোখ পড়তেই দেখলেন,একজন মোটা, কালো লম্বা চুলের লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। খালি জায়গায় কাঁথায় মোড়ানো কিছু একটা পড়ে আছে। ফরিনা ছুটে বাইরে আসেন। নাতনির রক্তাক্ত দেহ দেখে চিৎকার শুরু করেন। পুলিশ কোনো কিনারা খুঁজে পায়নি। এরপরের দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে

উঠে। পদ্মজা মাঝরাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। খাওয়া-দাওয়া একদমই করতো না। মাঝরাতে মেয়ের কবরে ছুটে যেত। আমির পদ্মজাকে নিয়ে হাওলাদার বাড়ি থেকে দূরে সরে আসে। প্রায় এক বছর পদ্মজা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এরপর বুকে ব্যথা নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে,একদিন ফিরবে অলন্দপুর। সেই নিষ্ঠুর খুনিকে শাস্তি দিবেই। জানতে চাইবে,কীসের দোষে তার তিন মাসের কন্যা বলি হলো?

কেউ জানুক আর নাই বা জানুক,পদ্মজা জানে হাওলাদার বাড়িতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য,পারিজার খুনিকে বের করা। সে শতভাগ নিশ্চিত এই বাড়ির কেউ না কেউ জড়িত এই খুনের সাথে। শুধু বের করার পালা। পুরনো কথা মনে পড়ে পদ্মজা দুই চোখ বেয়ে

জল গড়াতে থাকল। আমির জল মুছে দিল। এরপর বলল,'বোধহয় তিন তলায় রাখা হয়েছে।'

পদ্মজা তিন তলার সিঁড়ির দিকে তাকাল। শুনেছে,তিন তলার কাজ নাকি সম্পূর্ণ হয়েছে। অনেকগুলো ঘর হয়েছে। সে আর কথা বাড়াল না। এখন গোসল করা উচিত। আযান পড়বে। আজ রাত থেকেই সে নিশাচর হবে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে,সব রহস্যের জাল কাটতে হবে। এটাই তার নিজের সাথে নিজের প্রতিজ্ঞা।

আমির ডাকল,'কী হলো? কী ভাবো?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল,'কিছু না। ঘরে চলুন।'

'কিছু তো ভাবছিলে।'

'এতদিনের জন্য আসছি গ্রামে। চাকরিটা থাকবে তো?'

‘থাকবে না কেন? রফিক কতোটা সম্মান করে আমাকে দেখোনি? আর তোমার যোগ্যতার কী কমতি আছে? যেখানে ইচ্ছে সেখানেই চাকরি হবে।’

পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,’আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে চাকরি করতে দিবেন?’

আমির হেসে ফেলল। বলল,’তা অবশ্য দেব না।’

চলবে…